ISSN 2072-3334
Development Compilation
Volume 10. Number 02. March 2014

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উদ্ভবের মিথ বা কারাম বিনতী : একটি সমীক্ষা

ড.এ.এইচ.এম. তাহমিদুর রহমান*

Abstract : In the sphere of Bangladeshi tradition, the history of Santal population's participation is ancient. Bangladeshi culture has always been enriched by this primitive population's connection to it. Just as their colourful life, the creation "myth" of Santal population is equally fascinating which they call "Karam Binthi" in their own words. As this population do not have their own alphabet and therefore lag behind in education, it's "Karam Binthi" is being practiced verbally, chiefly through poems and songs till to date. This article focuses on the overall aspects of "Karam Binthi" along with the story of Santal population's being a part of Bangladeshi tradition through this myth itself.

ভূমিকা

সাঁওতাল জাতির উদ্ভব ও তাদের আদিযুগের ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকেই নানা পৌরাণিক কাহিনী, লোককথা প্রচলিত আছে। শত শত প্রজন্ম ধরে তাদের সৃষ্টিতত্ত্বের ও বংশবৃদ্ধির কাহিনী লোক মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে নিজেদের ভাষায় তারা একে বলে 'কারাম বিনতী'। গান, গাঁথা, গল্প হিসেবে যুগ যুগান্ড়র ধরে এগুলো সাঁওতাল সমাজে চর্চিত হয়ে এসেছে। অবশ্য স্থান কাল ভেদে এসব কাহিনীতে যথাকিঞ্চিত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও মূল-বিষয় বা মোটিফ থেকেছে অভিন্ন তার অন্ড়র্নিহিত বক্তব্য ও অক্ষুন্ন রয়ে গেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রাম গুলোতে গিয়ে গিয়ে কারাম বিনতী সংগ্রহ করেছি তা পাঠে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এগুলোর অন্ড়র্নিহিত বক্তব্য প্রায় একই। সাঁওতালদের 'মিথ', গল্প বা গানের তেমন কোনো পুস্ড়ক নেই, যেটা পড়ে পরবর্তী প্রজন্মেরা জানবে, বর্তমানে মিডিয়া তথা সংবাদ মাধ্যমগুলোর যেখানে এত দাপাদাপি, সেখানেও জাতীয় স্ড়রে কোনো ব্যবস্থা বা শক্ত সংগঠন নেই যার মধ্যে দিয়ে তারা তাদের উন্নয়নের অবস্থান বা চিন্ড়া ভাবনার সংযোগ ঘটাতে পারে। তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ড়ে, এমনকি বাইরেও ছড়িয়ে থাকা সাঁওতালদের মধ্যে তাদের 'মিথ', পুরানো গল্প বা গান ধারাবাহিকভাবে তাদের পরবর্তী বংশধরদের কাছে চলে আসছে। লক্ষণীয় যে বিষয় তা হলো বাংলাদেশের সাঁওতালরাও কারাম বিনতীর গানে যে সুর ও তাল ব্যবহার করছে তা আমি পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়খ"ে অভিন্ন লক্ষ্য করেছি। এই মুখে-মুখে চলে আসার যে সংস্কৃতি (oral tradition) এটি কেমনভাবে কাজ করে! সেটার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা সমাজ বিজ্ঞানীরা হয়ত দিয়েছেন। এই নিবন্ধের মধ্যে সেই পুঁথিগত দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করব না। বরং সাঁওতাল 'মিথ' ও

* সহযোগী অধ্যাপক, চার"কলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

তাঁদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সাঁওতালদের নিজস্ব সামাজিক পরিকাঠামো কি শক্তি বলে তাদের আবেগ ও অনুভূতিকে এখনও জীবন্ড় করে রেখেছে, সেটাই বেশি করে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

উৎস

প্রত্যেক জাতি বা সমাজেরই উত্থানের পেছনে একটা ইতিহাস থাকে। সময়ের সাথে সেই ইতিহাস কারও কাছে হারিয়ে যায়, কারও কাছে অস্পষ্ট, আবার কারও কারও কাছে নিছকই একটা 'মিথ' বা গল্প হয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু সাঁওতালদের মতো অনেক আদিবাসীই আছেন যাঁদের কাছে সেই 'মিথ', গল্প বা গানই শত শত বছর ধরে তাঁদের সমাজ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে আসছে।

বিষয় বিবরণ

সাঁওতাল 'মিথ' বলতে আমরা সাঁওতালদের 'কারাম বিনতী' কেই ধরে থাকি, যেখানে পৃথিবীর সৃষ্টি ও সাঁওতাল পূর্বপুর"ষদের জন্মের কথা বলা আছে। সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন 'কারাম বিনতী' (সৃষ্টিতত্ত্বের কথা) তাঁরা তাঁদের পূর্বপুর"ষদের কাছ থেকে মুখে-মুখেই শিখে এসেছেন। যাঁরা এই 'কারাম বিনতী'র কথা বলেন তাঁদেরকে সমাজে কারাম গুর" বলা হয়। এই কারাম গুর"রা বিভিন্ন গ্রামে গ্রামবাসীদের দ্বারা আমন্ত্রিত হন, এবং অনেক কারাম গুর" একসঙ্গে মিলে গ্রামবাসীদের 'সৃষ্টিতত্ত্বের' কথা গানের আকারে শোনান। এই কারাম বিনতী চলাকালীন গুর"দের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্কও চলে, কারণ কারাম বিনতীর তেমন কোনো বই নেই। যাঁরা এই সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলেন তাঁরা সকলেই কোনো না কোনো গুর"র কাছ থেকে শিখেছেন, এবং তাঁরা যা বলেন তা তাঁদের স্মরণ শক্তি থেকেই বলেন।

ভারতের পশ্চিম-বঙ্গের ঝাড়খ" ও বীরভূম জেলাতে কারাম গুর"রা যে 'কারাম বিনতী' পাঠ করে থাকেন তার বঙ্গানুবাদ অনেকটা নিম্নরূপ- "তখন চারিদিকে কেবল জলে পরিপূর্ণ ছিল, নিচে ছিল মাটি। 'ঠাকুর জিউ' (ভগবান) প্রথমে জলের জীব সৃষ্টি করলেন, কুমীর, বোয়াল মাছ, শোল মাছ, চিংড়ি, কেঁচো, কচ্ছপ ইত্যাদি। তারপর ঠাকুর ভাবলেন মানুষ সৃষ্টির কথা, তখন মাটি দিয়ে দুটো মানুষ তৈরি করলেন, একটি পুর"ষ ও একটি নারী। যখন তিনি তাদের ফুঁ দিয়ে জীবন দান করতে যাবেন তখন আকাশ থেকে সিঞ সাদম (উড়ন্ড় ঘোড়া) এসে তাদের ভেঙে চুরমার করে দিলেন, ঠাকুর মনে কষ্ট পেলেন। তখন তিনি হাঁস ও হাঁসী নামে দুটো পাখি তৈরি করলেন। পাখি দুটো সারা দিন উড়ে বেড়ায়, ক্লান্ড় বোধ করলে ঠাকুরের হাতে এসে বসে। একদিন তারা ঠাকুরকে বলল, 'আমরা তো ঘুরছি কিন্তু খাওয়া পাব কোথায়?' ঠাকুর বললেন, 'সত্যিই তো।' তিনি কুমিরকে ডেকে বললেন তুমি পানির তলা থেকে মাটি তুলে আনতে পার? সে রাজি হলো কিন্তু পারল না, সমস্ড় মাটি পানিতে গলে গেল। তারপর তিনি চিংড়ি মাছকে ডাকলেন, সেও পারল না, এই ভাবে বোয়াল মাছ, কাঁকড়া সবাইকে ডাকলেন কিন্তু কেউ সফল হলো না। অবশেষে কেঁচো সফল হলো মাটি আনতে, ঠাকুর তখন কচ্ছপকে ডেকে তার চারটে পা শেকল দিয়ে বেঁধে কেঁচোকে বললেন কচ্ছপের পিঠে মাটি তুলে জড়ো করতে। কেঁচো নিজের মুখটা পানির তলায় রেখে লেজটা কচ্ছপের পিঠে ফেলে, মাটি খেয়ে পিঠে ফেলতে লাগল। এই ভাবে সৃষ্টি হলো ভূমি, তারপর ঠাকুর মই দিয়ে সমস্ড় মাটি সমান করলেন, যে জায়গা উঁচু হলো সেটি পরিণত হলো পাহাড়ে, আর নিচু জায়গায় তৈরি হলো জলাশয় ইত্যাদি। ঠাকুর তারপর বিভিন্ন রকমের ঘাস, গাছ ইত্যাদি লাগালেন। তখন পাখি দুটো 'শিরোম ধান্ধি' (বেনাগাছের ঝোপে) তে বাসা বেঁধে দুটি ডিম পাড়ল, সেই ডিম থেকে জন্ম

নিল প্রথম মানব ও মানবী। সাঁওতালরা এদেরকে 'পিলচু হাড়াম' ও 'পিলচু বুড়হি' বলে। ঠাকুর এদেরকে 'হিহিড়ি-পিপিড়ি' নামক জায়গায় রাখলেন এখানে লিটো বলে একজন এসে তাদেরকে 'হাড়িয়া' তৈরি করতে শিখালেন বিভিন্ন ঘাস ও শেকড় দিয়ে। পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হির সাতটি ছেলে ও সাতটি মেয়ে জন্ম নিল এবং ভাই বোনদের মধ্যে বিবাহ দিলেন। ছেলে মেয়েরা আর যাতে নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক না করতে পারে তার জন্য তাদের সাতটি গোত্রে ভাগ করে দিলেন। সাঁওতালদের অনেক সংখ্যা বৃদ্ধি হলো। তারপর তারা 'হিহিড়ি-পিপিড়ি' ছেড়ে 'খজ কামান' দেশে গেল, এখানে তারা বিপথগামী হলো, ঠাকুর রেগে গেলেন। একজোড়া পবিত্র পুরুষ ও স্ত্রীকে তিনি 'হারাতা' পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে থাকতে বললেন। তারপর তিনি সাতদিন সাতরাত আগুনের বৃষ্টি পাঠালেন যার ফলে অনেকে মারা গেল। হারাতা পাহাড়ের কোল বেয়ে তারা চলে এল 'সাসাং বেডায়'। এখানে সাঁওতালদের আবার অনেক বৃদ্ধি হলো এবং বারটি গোত্রে ভাগ হলো- কিস্কু, হেমরম, সরেন, টুডু, বাসকী, হাঁসদা, বেসরা, মারাি, মুর্মু, চড়ে, পাউড়িয়া ও কঁয়ডা ইত্যাদি। 'সাসাং বেডা' থেকে তারা এল 'জীরপি দিশীম', সেখানেও ওরা বেশিদিন থাকতে পারেনি। সেখান থেকে পালাবার পথে তারা একটা বড় পাহাড় সামনে পেল যা পেরোবার পথ পাচ্ছিলনা। তখন তারা 'মারাং বুরু' দেবতাকে স্মরণ করল এবং কথা দিল যদি তারা পেরোবার পথ পায়, তাহলে পরে তাঁকে দেবতা ভেবে পূজা দেবে। অবশেষে তারা রাস্তা খুঁজে পেল। এখান থেকে সাঁওতালদের পূর্বপুরুষরা 'আইরে দেশ' 'কাঁইড়ে দেশ' অতিক্রম করে অবশেষে 'চাম্পা দেশে' বাসা বাঁধলো। এইখানে পূর্বপুরুষরা অনেক বছর ছিল এবং খুবই প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। চাম্পা দেশেই তারা বিভিন্ন 'গাড়' (গড় বা দুর্গ) নির্মাণ করল। কিস্কুদের 'কঁয়ডা', মুর্মু গোত্রদের জন্য ছিল 'চাম্পাগাড়', মারািদের 'বাদলি', টুডুদের 'সিমগাড়', ইত্যাদি অনেক দুর্গ ছিল। কৈলান হাড়াম-এর কথায়, 'আমাদের পূর্বপুরুষরা গোত্র অনুযায়ী এখানেই তাদের পেশাও নির্দিষ্ট করেছিল- যেমন, কিস্কুরা ছিল আমাদের রাজা, মুর্মুরা ঠাকুর, সরেনরা সিপাহি, মারািরা ছিল ধনী ব্যক্তি এবং নাচ ও গানে পারদর্শী ছিল টুডুরা। বাসকীরা বেচাকেনায় মন দিত। চাম্পাদেশ পর্যন্ড় অন্যান্য আদিবাসীরাও সাঁওতালদের সঙ্গে ছিল যেমন মুা, কুরমি, বিরহড়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গেল। বিরহড়রা হনুমানের মাংস খেয়েছিল বলে সাঁওতালরা তাদের 'বিটীল' (একঘরে) করে দিল। কুড়মিরা ক্রমে দিকুদের (অসাঁওতাল) সঙ্গে মিশে গেল। মুারাও অন্যত্র চলে গেল।

সেই সময় কিস্কু রাজার মেয়ে বিজাতীয়কে ভালবেসে অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছিল। মারািরা তাকে মানুষ করে। তার নাম ছিলো মাধো সিং। কোনো পরিবারই তাকে বিয়ের জন্য মেয়ে দিতে রাজি ছিল না। সে ছিল অত্যাচারি ও হিংস্র। যখন সে জানল কেউ তাকে মেয়ে দিতে রাজি নয় সে রেগে বলল যাদের ঘরেই মেয়ে পাব, তাদেরকেই সিন্দুর দেব জোর করে। এই সব অপকাে করে সে সবাইকে আতঙ্কিত করত। ফলে নিজের মা বোনদের ইজ্জত বাঁচাতে পূর্বপুরুষরা চাম্পা দেশ ছেড়ে পালাল। চলে এল 'তোড়ে পুখরি বাহা বান্দেলাতে', এখানেও সাঁওতালরা অনেকদিন ছিল। কিন্তু 'দিকু' (অসাঁওতাল) রা এখানে তাদের শান্ড়িতে বসবাস করতে দিল না। তাই পুর্বপুরুষরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে সিদ্ধান্ড় নিল যে 'আমাদের যদি শান্ড়িতে বাস করতে হয়, তাহলে আমাদের নিয়মকানুন তৈরি করতে হবে'। তখন তারা 'তোড়ে পুকুরের' ধারে শাল গাছের তলায় 'পরানি' (পদ্মফুল) পাতার উপর বসে ও 'কিয়ী' ঝর্ণার জল পান করে ১২ বছর ১২ দিন আলোচনা করল। তৈরি করল সাঁওতালদের প্রথম নিয়ম কানুন, জন্মের সময়, বিয়ে বা মৃত্যুর সময় কি কি আচার অনুষ্ঠান থাকবে, দিকুদের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়াও নিজেদের মধ্যে বসবাস করার পদ্ধতি। যখন

তারা আলোচনা শেষ করল, মহিলোরা পাকুর গাছের ও পুরুষরা মহুয়া গাছের তলায় জড়ো হলো, দেখল তখনও 'পরানি' (পদ্ম ফুল) পাতা মুড়ে শুকিয়ে যায়নি। তারা বলল, 'হ্যাঁ আমরা আমাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য সঠিক নিয়ম কানুনই তৈরি করেছি'।

কারাম গুরু শেষে যে কথাগুলো বলেছেন তা হলো- "আমাদের পূর্বপুরুষদের সমস্ড় নিয়মকানুন আমরা রাখতে পারিনি, সময়ের সাথে সাথে দিকুদের সঙ্গে মিশে অনেক নিয়মই ওদের মতো হয়ে গেছে। তারপর মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ হলো। আমরা চাম্পা দেশ ছেড়ে পালালাম। অনেকে চলে গেল শিরাতে, শিকীর নাগপুরের দিকে, আমরা সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম, 'খেড়োয়াড়' নামও আমরা হারালাম। পুর্বপুরুষরা বলেছিল যেখানেই যাও 'অজয় নদী' তোমরা পার হয়ো না। যারা পার হবে তাদের পেটের সন্ড়নকে টেনে বের করে হত্যা কর। কারণ ওপারে হচ্ছে 'তুড়ুক' (মুসলমান) দের দেশ। পেটের টানে আমরা পেরিয়ে এলাম। জঙ্গল, মাঠঘাট কেটে পরিস্কার করে চাষের ও বসবাসের জমি তৈরি করলাম, দিকুরা সব নিয়ে নিল। আমরা অনেক পথ হেঁটেছি, গুটি পোকার মতো একটা দেশ থেকে আর একটা দেশে বেড়িয়েছি। জানিনা আরো কোথায় যাব, ঠাকুর আমাদের আরও কত দূর টেনে নিয়ে যাবেন।"

আজ পর্যন্ড় সাঁওতাল মিথের যতটুকুই আমরা পেয়েছি তার প্রায় শতভাগ তথ্যই আমরা গান ও গল্পের আকারে পেয়েছি। গল্প অবস্থা বুঝে বললেও, গানের জন্য সাঁওতালদের কোনো নির্দিষ্ট সময় বা মুহূর্ত নেই। গ্রামের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কথা বাদ দিলেও, পথে, ঘাটে, মাঠে, জঙ্গলে, আর বিশেষ করে সাঁওতাল রমনীদের মুখে গুণ গুণ করে গানের সুর যেন লেগেই থাকে। সাঁওতালদের মুখে মুখে উচ্চারিত মিথের গান এখনও আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা সাংস্কৃতিক মঞ্চে শুনতে পাই,

যেমন :

হিহিড়ি-পিপিড়ি রেবুন জানাম লেনা খজকামান রেবুন খজ লেনা হারাতা বুরু রেবুন হারা লেনা
সাসাং বেডা রেবুন জাতিয়েনা হো ॥

অর্থাৎ : হিহিড়ি পিপিড়িতে আমরা জন্মেছিলাম খজ কামানে নিজেদের খোঁজ নিয়েছিলাম হারাতা পাহাড়ে আমরা মানুষ হয়েছিলাম সাসাং বেডায় গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েছিলাম ॥

কিংবা 'মিথ'-এর গল্প নিয়ে জনপ্রিয় সেই গান- চাইচাম্পা গাড় দ লিলিবিচি বাদলি গঁয়ডা লিকন
গড়হন দায়াগি চাইচাম্পা দায়াগি বাদলি গঁয়ডা দায়াগি গাড় দবুন বাগিয়াদা ॥

অর্থাৎ : আমাদের চাম্পা দেশ ছিল যেন কত সাজানো গোছানো বাদলিও ছিল আঁকি বুকি কত কি দিয়ে সাজানো হায় চাম্পা হায় বাদলি তোমাদের ফেলে এলাম কোথায় ॥

এমন অসংখ্য গানের মধ্যে লুকিয়ে আছে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জাতিসত্ত্বার নানা কথা নানা ইতিহাস।[১]

এবার বাংলাদেশে যে 'কারাম বিনতী' আমি সাঁওতাল গ্রামগুলো ঘুরে শুনেছি তাও প্রায় একই রকম সুতরাং এ অংশ বর্ণনায় পূর্বের মিথের বর্ণানার অনেক অংশ মিলে যাবে এটাই স্বাভাবিক। এ বিশ্বব্রহ্মাে আদিতে ছিল নিরাকার এবং মহাশূন্য। এই নিরাকার বিশ্বব্রহ্মাে ঠাকুর জিউ মারাংবরু ও অন্যান্য দেবতাগণ শুধুমাত্র বিরাজমান ছিল। দেবতাকুল নিরাকার মহাশূন্য এবং অসীম জলরাশীতে রাজত্ব করতো। এই সময় দেবতাদের মধ্যে থেকে এক দেবতা ঠাকুর জিউকে বললো, মানুষের জন্ম হলে খুব ভালো হতো। তখন দেবতাদের প্রধান অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ঠাকুর জিউয়ের মনে কথাটা খুব ভালো লাগলো। ঠাকুর জিউ তখন স্বর্গের মালিনী বুড়িকে দুটি মনুষ্য মূর্তি তৈরি করার

নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পাওয়া মাত্র মালিনী বুড়ি দুটি মানুষের মূর্তি তৈরি করে ফেললো। কাদামাটি দিয়ে তৈরি মানুষের মূর্তি দুটো রোদে শুকোতে দেওয়া হলো। এমন সময় স্বর্গের ঘোড়া নিরাকারের মধ্যে পানি পান করতে নামছিল। মানুষের মূর্তি দুটো চোখে পড়ামাত্র স্বর্গের ঘোড়া লাথি মেরে ভেঙে ফেললো। ঠাকুর জিউ এ ঘটনায় খুব দু:খ পেলেন এবং মালিনী বুড়িকে পুনরায় মূর্তি দুটো মেরামত করার নির্দেশ দিলেন। মালিনী বুড়ি মূর্তি দুটো আগের মতোই মেরামত করে ফেললো। তখন ঠাকুর জিউ মূর্তি দুটোয় প্রাণসঞ্চারের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ঠাকুর জিউ মালিনী বুড়িকে বললেন, 'আমার ঘরে দুটো প্রাণ ঝোলানো রয়েছে, একটা প্রাণ ঝোলানো আছে ঘরের দরজার সাথে এবং আর একটা প্রাণ ঝোলানো আছে ঘরের চালের সঙ্গে।' এই কথা বলে ঠাকুর জিউ মালিনী বুড়িকে সতর্ক করে দিলেন দরজার সঙ্গে ঝোলানো প্রাণ হচ্ছে মানুষের প্রাণ। কিন্তু মালিনী বুড়ি ছিল বেঁটে, তাই সে চালের সঙ্গে ঝোলানো প্রাণ আনতে ব্যর্থ হলো। তাই সে ঘরের দরজার সঙ্গে ঝোলানো যে প্রাণ ছিল তাই নিয়ে এলো। ঠাকুর জিউ বুঝতে পারেননি মালিনী বুড়ি কোনো প্রাণটা নিয়ে এসেছে। না বুঝে ঠাকুর জিউ ওই মূর্তি দুটোর মধ্যে মালিনী বুড়ির আনা প্রাণ প্রবেশ করিয়ে দিলেন। আর তক্ষুনি কাদামাটি দিয়ে তৈরি মানুষের মূর্তি দুটো পাখি হয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। পাখি দুটো মহাশূণ্যে এবং অসীম জলরাশির উপর দিয়ে উড়তে থাকলো। এই পাখি দুটো ছিল রাজহাঁস জাতীয়। এই রাজহাঁস দুটো অসীম জলরাশিতে কোথাও নামার মতো জায়গা পেল না, কারণ তখনো পৃথিবীর সৃষ্টি হয়নি। এই ঘটনায় ঠাকুর জিউ মালিনী বুড়ির চালাকি বুঝতে পেরে ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং মালিনী বুড়িকে ঠাকুর জিউ পেত্নী বানিয়ে দিলেন।

দেবতাদের অনুরোধে ঠাকুর জিউ পাখি দুটোর বসবাসের জন্য জায়গা করে দিতে রাজী হলেন। দেবতাকুল তখন ঠাকুর জিউয়ের সামনে এক সভায় মিলিত হলো। দেবতারা সাগরের কুমিরকে ডেকে বললো, পাতাল থেকে মাটি নিয়ে আসতে, সেই মাটিতে হাঁসা আর হাঁসীর জন্য স্থান করে দেওয়া হবে। দেবতাদের কথা মতো কুমির সাগরের তলদেশে ডুব দিয়ে পিঠে করে মাটি আনতে চেষ্টা করলো। কিন্তু উপরে উঠতে উঠতে মাটি আবার ধুয়ে সাগরে পড়ে গেল। দেবতারা তখন চিংড়ি মাছকে বললো মাটি আনতে, কিন্তু চিংড়ি মাছও মাটি আনতে পারলো না। তারপর রাঘব বোয়ালকে বলা হলো মাটি আনতে, কিন্তু রাঘব বোয়ালও মাটি আনতে ব্যর্থ হলো। এরপর কাঁকড়াকে বলা হলো মাটি আনতে, কিন্তু কাঁকড়াও মাটি আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। দেবতারা তখন মহা ভাবনায় পড়ে গেল। কিন্তু কোনো ভাবনাতেই কিছু হলো না। তখন কেঁচো দেবতাদের পরামর্শ দিলো কচ্ছপের চার পা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখতে আর কেঁচো কচ্ছপের পিঠের উপর মাটি তুলবে, তাতে মাটি আর সাগরে পড়বে না। তখন দেবতারা রৈমত লেন্ডোং অর্থাৎ কেঁচোর পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং কেঁচোকে নির্দেশ দিলেন সমুদ্রের তলদেশে থেকে মাটি তুলে আনতে। কিন্তু কেঁচো আপত্তি জানিয়ে বললো, 'আমি মাটি তুলে আনতে পারবো কিন্তু সাগরের মাছ যদি আমাকে খেয়ে ফেলে! একটা চোঙা পুঁতে দিলে আমি চোঙার ভিতর দিয়ে গিয়ে সাগরের তলদেশ থেকে মাটি নিয়ে আসবো।' তখন দেবতারা সাগরের মাঝখানে একটা চোঙা পুঁতে দিয়ে একটা কচ্ছপ ধরে নিয়ে এসে তার চার পা চারটা খুঁটির সঙ্গে কষে বাঁধলেন। তখন কেঁচো চোঙার ভিতর দিয়ে সাগরের তলদেশ থেকে মাটি তুলে এনে কচ্ছপের পিঠে মাটি ওঠাতে থাকলো। মাটি ওঠাতে ওঠাতে অনেক মাটি একইভাবে কচ্ছপের পিঠের উপর জমা হতে লাগলো। মাটি সূর্যের তাপে শুকিয়ে গেল। দেবতারা সেই মাটিতে মই দিল। যে সকল জায়গায় ঠিকমতো মই পড়েনি, সেখানে উই ঢিবি হয়ে থাকলো। এই ঢিবিগুলোই পাহাড়-পর্বত হিসেবে পরিচিত হলো। দেবতারা সেই মাটিতে ঘাস ছিটালো, গাছ রোপণ করলো এবং বিভিন্নরকম

ফুল ও ফল ধরলো সেই গাছগুলোতে। এইভাবে ফুল, ফল ও বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো সেই কচ্ছপের পিঠ- যাকে পৃথিবী বলা হলো। সাঁওতালরা বিশ্বাস করে, যখন কচ্ছপ নড়াচড়া করে তখনই ভূমিকম্প হয় ।

যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে গেল, তখন সেই রাজহাঁস ও হাঁসী নদীর ধারে বড় বড় ছন ঘাসের মধ্যে বাসা বাঁধলো। সেই বাসাতে হাঁসী দুটো ডিম পাড়লো। একদিন সেই ডিম দুটো থেকে দুটো মানব শিশু জন্ম নিল। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। মানব শিশু জন্মের পর হাঁসা আর হাঁসী আনন্দে গান গেয়ে উঠলো-

হায় ! হায় ! সাগরের জলরাশিতে
হায় ! হায় ! এই দুটো মানব শিশু
হায় ! হায় ! ডিম থেকে বাচ্চা হলো
হায় ! হায় ! এই দুটো মানব শিশু
হায় ! হায় ! কোথায় রাখা হবে
হায় ! হায় ! ঠাকুর জিউ ঠাই দেবে
হায় ! হায় ! কোথায় রাখা হবে।

তারপর হাঁসা আর হাঁসী মানবশিশু দুটোকে ঠাকুর জিউয়ের কাছে নিয়ে আসলো। ঠাকুর জিউ তখন পাখি দুটোকে পরামর্শ দিলেন, 'তোমরা যে ফল খাও, সেই ফলের রস তুলার মধ্যে করে শিশুদের মুখে দিয়ে দাও।' ঠাকুর জিউয়ের পরামর্শ মেনে পাখি দুটো শিশুদের ফলের রস খাওয়ালো। এইভাবে শিশু দুটো বড় হতে থাকলো। ক্রমে তারা হাঁটা শিখলো। পাখি দুটো তখন ভাবতে থাকলো এই শিশুদের কোথায় রাখা যায়। কারণ পাখির বাসা কোনো মতেই মানবশিশুর জন্য উপযুক্ত নয়। ঠাকুর জিউ তখন আবার পাখিদের পরামর্শ দিলেন, 'তোমরা শিশুদুটোকে পিঠে করে উড়ে যাও, খুঁজে দেখো কোথায় বসবাসের মতো জায়গা পাওয়া যায়।' পাখী দুটো তখন শিশুদের পিঠে করে যেদিকে সূর্য ডোবে সেদিকে উড়ে গেল। একটা জায়গা তাদের পছন্দ হলো-যার নাম 'হিহিড়ি পিপিড়ি'। এই হিহিড়ি পিপিড়ি নামক স্থানে পাখি দুটো শিশুদের রেখে আসলো। এই জায়গা কেউ কোনোদিন দেখেনি। এই স্থান বা'বুল দেশ। এখানে শিশু দুটো বড় হলো। শিশু থেকে তারা হলো যুবক আর যুবতী। একজনের নাম হলো পিলচু হাড়াম আর একজনের নাম হলো পিলচু বুড়ি। এই হিহিড়ি পিপিড়ি নামক স্থানে তারা শ্যাম ঘাস আর বিভিন্ন রকম ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ কতে থাকলো। কিন্তু তারা পোশাক কাকে বলে তা বুঝতে শেখেনি। তারা সব সময় উলঙ্গ থাকতো। তাদের মনে কোনো লজ্জা-সংকোচ ছিল না। তারা সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে থাকলো।

পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুড়ির দিনগুলো কিন্তু বেশ কাটছিল। একদিন তাদের জীবনে আবার নতুন করে ওলটপালট হয়ে গেল। পাহাড়ের দেবতা মারাংবর একদিন ছদ্মবেশে পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুড়ির কাছে গেলো। তাদের জিজ্ঞাসা করলো, 'নাতি-নাতনী তোমরা কেমন আছো? আমি তোমাদের নানা হই। তোমাদের দেখতে এলাম।' পিলচু বুড়ি আর পিলচু হাড়াম তো অবাক, তাদের যে কোনো আত্মীয়স্বজন আছে তা তাদের জানাই ছিল না। যা হোক, তারা দুজনেই ছদ্মবেশী দেবতা মারাংবরকে সাদরে গ্রহণ করলো। মারাংবর তাদের ঘাসের বীজ থেকে ভাত তৈরি করতে শেখালো আর বনের ভেতর থেকে একরকম গাছের শিকড় কেটে তার রস দিয়ে ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে হাঁড়িতে করে পাতা দিয়ে ঢেকে রাখতে বললো। পাঁচদিন পর মদ তৈরি হলো। মারাংবর তাদের বললো, ওই হাড়িতে পানি ঢেলে দাও। আমার নামে পূজা দাও, আর তোমরা মনের সুখে পান

করো। আমি আগামীকাল আবার আসবো।' পিলচু বুড়ি তিনটা পাতা নিয়ে আসলো। একটা পাতা দিয়ে মারাংবরুর নামে পূজা করলো আর দুটো পাতা দিয়ে নিজেদের নামে পূজা দিলো, তারপর দুজনে হাঁড়িতে তৈরি মদ পান করতে শুরু করলো। দুজনের আনন্দ আর ধরে না। তারা নাচ-গান আর আনন্দ করতে করতে হাঁড়ির সব মদ পান করে ফেললো। তারা তখন বেহুঁশ হয়ে পড়লো এবং দুজনে জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়লো। আগে কিন্তু তারা এরকম কোনোদিন করেনি। পরের দিন সকালে বেশ বেলা হয়ে গেছে, তবু তাদের ঘুম ভাঙে না। এমন সময় মারাংবরু আবার এসে হাজির হলো। মারাংবরু তাদের ডেকে বললো, 'নাতি-নাতনী তোমরা ঘুম থেকে ওঠো। এদিকে এসো।' ঘুম ভেঙে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি দেখলো তারা দুজনেই উলঙ্গ। তখন তারা খুব লজ্জা পেল। তারা তখন মারাংবরুকে বললো, 'দেবতা মারাংবরু আমরা খুবই লজ্জা পাচ্ছি, আমরা কাল রাতে কি যেন করেছি।' দেবতা মারাংবরু তাদের বললো, 'এটা কোনো খারাপ কিছু না।' এরপর মারাংবরু গাছের পাতা দিয়ে তাদের লজ্জা নিবারণ করতে শেখালো।

পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুড়ির ঘরে সাত পুত্র আর সাত কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করলো। তাদের প্রথম পুত্রের নাম হলো সানড্রা, দ্বিতীয় পুত্রের নাম সানঢম, তৃতীয় পুত্রের নাম চাঁড়ে, চতুর্থ পুত্রের নাম মানে এবং পঞ্চম পুত্রের নাম আচেয়েরেদেহু। আর প্রথম কন্যার নাম সিতা, দ্বিতীয় কন্যার নাম খাপড়া, তৃতীয় কন্যার নাম হেইসি, চতুর্থ কন্যার নাম চুমনি। দিনে দিনে এই পুত্র-কন্যারা বড় হয়ে উঠতে থাকলো। পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি একদিন রাতে গল্প করলো ছেলেমেয়েদের কিভাবে বিয়ে দেওয়া যায়। পৃথিবীতে মানুষ বলতে তো ওরা দু'জন এবং তাদের ছেলেমেয়েরা। দু'জনেই একমত হলো যে, ছেলেমেয়েদের মধ্যেই এই বিয়ে দিতে হবে। পিলচু বুড়ি পিলচু হাড়ামকে বললো, 'তুমি ছেলেদের নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাও। যাতে ওরা নিজেদের ভাই-বোন হিসেবে ভাবতে না পারে।' পিলচু হাড়াম তখন ছেলেদের নিয়ে বনে-জঙ্গলে শিকার করতে বেরিয়ে পড়লো। এদিকে পিলচু বুড়ি গেলো মেয়েদের নিয়ে শাক-শবজী সংগ্রহ ও বন থেকে কাঠ যোগাড় করে আনতে। এভাবে অনেক দিন ছেলে মেয়েরা আলাদা থাকলো। এক দিকে ছেলেরা বনে-জঙ্গলে পশু-পাখি শিকার করতো আর অন্যদিকে শাক-শবজী ও ফলমূল সংগ্রহ করতো। একদিন মেয়েরা 'সরুকদ্' নামক এক বনে শাক তুলতে গেল। শাক তোলা শেষে তারা একটা বুড়ো বটগাছ দেখে সেখানে বিশ্রাম নিতে গেল। বটগাছের অনেক ঝুলন্ত শিকড় ছিল। তা দেখে মেয়েরা তাতে দোল খেতে থাকলো। মেয়েরা খুবই আনন্দ উপভোগ করলো এবং নাচতে থাকলো আর মনের সুখে গান গেয়ে উঠলো:

মুইকো মুইকো মাকো দুংগুত দুংগুত দ, নায়ো
চাপা কিয়ে বাড়ে লাতার ডাহার রেকো দুংগুত দুংগুত দ।
অর্থাৎ-
মা বট গাছের নিচে লাল পিপড়েরা
কেমন জড়াজড়ি হয়ে নাচানাচি করছে।

এদিকে ছেলেরা ওই দিনেই খান্ডরাই বন থেকে শিকার করে ফিরছিল। আজকে তারা একটা বড় হরিণ শিকার করতে পেরেছে। তাই তাদের মনও যথেষ্ট আনন্দ আর খুশিতে পূর্ণছিল। পথে তারা হঠাৎ করেই ভারী কণ্ঠের সংগীত শুনে থমকে দাঁড়ালো। তারা দেখতে পেলো একদল মেয়ে সারিবদ্ধভাবে নাচছে আর সেই সাথে গান গাইছে। ছেলেরাও তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে শিকার রেখে মেয়েদের সঙ্গে নাচগানে মেতে উঠলো। নাচের সঙ্গী হিসেবে বড় ছেলে বড় মেয়েকে বেছে নিল আর মেজো ছেলে মেজো মেয়েকে।এইভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বামী ও স্ত্রী বেছে নিল। পিলচু বুড়ি তখন পিলচু হাড়ামকে বললো, 'ওরা নিজেরাই নিজেদের সঙ্গী বেছে নিয়েছে। এখন আমরা একটা বড় ঘর তুলবো। এই ঘরে সাতটা কামরা থাকবে।' এইভাবে ঘর তৈরি হয়ে গেল।

একটা কক্ষ একজোড়া ছেলেমেয়ের জন্য বরাদ্দ করা হলো। এইভাবে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিল। বিয়ে দেওয়ার পর ওদের আবার সন্তান বাড়তে লাগলো। পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুড়ির নাতিপুতির সংখ্যা যখন অনেক বেড়ে গেল তখন তারা হিহিড়ি পিপিড়ি স্থান থেকে চামার রাজ দেশে চলে গেলো। এখানকার একটা বড় পাহাড়ের নাম 'হারারাত'। আবার এখান থেকে তারা গেল 'খাজকামান' দেশে। এই দেশে এসে তারা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়লো। তারা যে সকল গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়লো তা হলো: কিসকু, মুরমু, হাসদা, হেমরম, মারান্ডি, সরেন, টুডু, বাসকে, বেসরা, চড়ে, পাওরিয়া, বেদেয়া প্রভৃতি। এই সকল গোত্র আবার বিভিন্ন রকমভাবে বিভক্ত হয়ে পড়লো। এইভাবে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চললো।

হারারাত পাহাড়বাসী লোকজন আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে গেল। তারা ক্রমান্বয়ে সৎপথ থেকে সরে আসলো। তখন সৃষ্টিকর্তা ঠাকুর জিউ তাদের ডেকে বললেন, 'হে মানুষ, আমার কাছে আবার ফিরে এসো।' কিন্তু কোনো মানুষ সৃষ্টিকর্তার কথা কর্ণপাত করেনি। তাই সৃষ্টিকর্তা ঠাকুর জিউ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি পিলচু বুড়ি ও পিলচু হাড়ামকে পাহারের গুহায় প্রবেশ করতে বললেন। তারপর ঠাকুর জিউয়ের নির্দেশ মতো সাতদিন সাতরাত অগ্নিবৃষ্টি হতে থাকলো। যারা শুধুমাত্র হারারাত পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করেছিল তারাই শুধুমাত্র বাঁচতে পারলো।

এয়ায় সিং এয়ায় নিন্দ সেংগেল দাঃ-এ লেদা হো
এয়ার সিং এয়ার নিন্দ জাডাম জাডাম হো
ওকারেবেন তাহেকানা হো মানোয়া।
অর্থাৎ
সাতদিন সাতরাত আগুন বৃষ্টি হলো
সাতদিন সাতরাত ভয়ানক ভয়ানক শব্দ হলো
তখন তোমরা মানুষ কোথায় ছিলে?

আগুন বৃষ্টি শেষ হলে তারা পাহাড় থেকে বের হলো। বের হয়ে তারা দেখতে পেলো অনেক গাছ-পালা পুড়ে গেছে, অনেক পশু-পাখি মারা গেছে। অনেক মানুষজন মারা গেছে। হারারাত পাহাড়ে তারা আবার ঘর বাঁধলো। আবার তাদের ঘরে অনেক ছেলেমেয়ে জন্ম নিল। এখান থেকে তারা 'সাসাংভেডা' নামক স্থানে গেলো। ওখান থেকে তারা 'জের পি' দেশে গেলো। তারপর সে স্থান থেকে তারা গেল 'আইর' বা ইরান দেশে। তারপর সে স্থান থেকে তারা 'কোঁয়ডা' দেশ অর্থাৎ আফগানিস্তানে গেলো। আফগানিস্তান তখন গান্ধারা নামে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পাঞ্জাবে সাঁওতালরা অনেক দিন রাজত্ব করেছে। সাঁওতালদের প্রাথমিক আবাসস্থল অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ বলে কোনো কোনো মহলের ধারণা। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সাথে সাঁওতাল তথা অন্যান্য আদিবাসীদের মিল রয়েছে। ধারণা করা হয় যে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ থেকে আদিবাসীরা বহু সময়ের ব্যবধানে বহু দেশ ঘুরে বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতে অবস্থান নিয়েছে।

সাঁওতালদের আত্মপরিচয় সম্পর্কিত বহুল প্রচলিত লোককাহিনী বা 'কারাম বিনতী' থেকে 'হিহিড়ি পিপিড়ি', খোজকামান, হরতাপর্বত, সমানবেদা, চায়ে-চম্পা, সিলদা, সিকর, নাগপুর, সির, প্রভৃতি স্থানের নাম পাওয়া যায়। হান্টার সাহেব 'হিহিড়ি পিপিড়ি' বলতে প্রজাপতির দেশ এবং চায়ে-চম্পা বলতে কুসুমিত দেশ বুঝিয়েছেন যারা সীমায়াতন হিমালয় থেকে ব্রহ্মপুত্র নদীর অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ডালটন চায়ে-চম্পাকে হাজারিবাগ বা রামগড় জেলায় অবস্থিত বলে মনে

করেন।[২] সান্তার জরপী (হরতা) পার্বত্য অঞ্চলকে পরেশনাথের পাহাড় বলে অনুমান করে। এছাড়া সিলদা, সিকর, নাগপুর, সির প্রভৃতির অবস্থান ভারতের বীরভূম জেলা থেকে শুর করে ভারতবর্ষেই বিভিন্ন স্থানে বলে মনে করা হয়।[৩] সমাজ বিজ্ঞানী ডালটন মত প্রকাশ করেন যে, পরবর্তীতে সাঁওতালরা পূর্ব বাংলায় তাদের বসতি গড়ে তোলে।

উপসংহার

সাঁওতাল সমাজের কারাম বিনতী অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ একটি বিষয় কারণ এর মাঝেই লুকিয়ে আছে তাদের উদ্ভবের কাহিনী। সাঁওতালরা বিশ্বাস করে তাদের উদ্ভবের কাহিনীই তাদের জীবন চলার একটি গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়। আজ পর্যন্ড় বাধ্যতামূলকভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্ড়রে তারা কারাম বিনতী পাঠ করে নতুন প্রজন্মকে জানিয়ে রাখে নিজেদের অতীত। বর্তমানে নানা ঘাত প্রতিঘাতে সাঁওতালরা ধর্মান্ড়রীত হচ্ছে, হয়তো একটা সময় এই কারাম বিনতী নতুন প্রজন্মরা জানতেই পারবেনা। আমি এই প্রবন্ধে কারাম বিনতী নিয়ে লিখতে চেষ্টা করেছি সেই কথা ভেবে যে এখানে অন্ড়ত বিষয়টি আলোচিত হয়ে থাকুক। সাঁওতাল পৌরানিক কাহিনী থেকে তাদের আদিনিবাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না পাওয়া গেলেও তাদের বিভিন্ন স্থানে স্থানান্ড়রিত হওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। নিরিবিলি জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল খুঁজতে খুঁজতে তারা ভারত বর্ষসহ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রবেশ করেছে সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক এবং নৃবিজ্ঞানীগণ একমত পোষণ করেছেন। সাঁওতালদের চমকপ্রদ 'কারাম বিনতী' বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁরা এদেশের মাটিতে সংস্কৃতিতে কিভাবে একাত্ম হয়েছে এবং নিজেদের অতীত জেনেছে তাই এই প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশঃ

১ সোনা মুর্মু, বড় বাসকী, গোকুল হাঁসদা, কুমকুম ভট্টাচার্য, *সাঁওতাল মুক্তধারায় প্রবেশ*, পুর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০১, পৃ.৮৮-৮৯।

২ E.T. Dalton, *Tribal History of Eastern India*, Cosmo Publication, Delhi, (2nd Print), 1973, p.221.

৩ W.W. Hunter, *A Comparative Dictionary of the Languages of India and High Asia with a Dissertation*, Trubner and Co, London, 1868, p.155.